চতুর্থ অধ্যায়

শূন্যের অসীম ঈশ্বর   
শূন্যের ধর্মতত্ত্ব

নতুন দর্শন সন্দেহ তৈরি করেছে  
আগুন নিভে গেছে  
হারিয়ে গেছে সূর্য ও পৃথিবী   
কেউ জানে না খুঁজবে কোথায়  
সব ভেঙে চুরমার   
সব যোগান, সব সম্পর্ক   
রাজপুত্র, প্রজা, বাবা, ছেলে হয়েছে বিস্মৃত  
  
~ জন ডন, অ্যানাটমি অব দ্য ওয়ার্ল্ড   
  
রেনেসাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল শূন্য ও অসীম। ইউরোপ ধীরে ধীরে জেগে উঠল অন্ধকার যুগ থেকে। জেগে উঠল শূন্য ও অসীম। অন্য ভাষায় কিছুই না ও সবকিছু। গির্জার এরিস্টটলীয় ভিত্তি গুড়িয়ে গেল। পথ খুলল বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের।   
  
যাজকশ্রেণী বিপদটা প্রথমে বুঝতে পারেনি। বড় বড় যাজকরা শূন্য ও অসীমের ভয়ানক ধারণা নিয়ে পরীক্ষা চালায়। যদিও গির্জার পছন্দের এ ধারণাগুলো ছিল প্রাচীন গ্রিক দর্শনের মূলে কুঠারাঘাত। রেনেসাঁ যুগে আঁকা সব চিত্রকর্মের কেন্দ্রে থাকত শূন্য। আর বিশপ ঘোষণা করেছিলেন, মহাবিশ্ব অসীম। সীমানাবিহীন। কিন্তু শূন্য ও অসীমের প্রতি ভালবাসা স্থায়ী হতে পারল না।   
  
গির্জ হুমকির মুখে পড়লে ফিরে গেল সেই প্রাচীন গ্রিক দর্শনে। আবারও গ্রহণ করল বহু বছর ধরে সমর্থন দিয়ে আসা এরিস্টটলের মতবাদ। কিন্তু ততদিনে বড্ড দেরি। শূন্য ততক্ষণে পাশ্চাত্যে আসন গেঁড়ে বসেছে। গির্জার আপত্তি আর কেউ কানে নিল না। শূন্যকে ছাড়তে রাজী নয় বিজ্ঞানসমাজ।   
  
খোসা খুলল বাদামের  
হে ঈশ্বর, বাদামের খোসায় আবদ্ধ হয়ে আমি নিজেকে অসীম জগতের রাজা ভাবলে কি আমি খারাপ স্বপ্ন দেখেছি?   
--- উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, হ্যামলেট  
  
রেনেসাঁর শুরুতে বোঝা যায়নি শূন্য যে গির্জার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে৷ শূন্য ছিল নিছক একটি শৈল্পিক হাতিয়ার৷ একটি অসীম শূন্যতা, চিত্রশিল্পের মাধ্যমে যা প্রস্ফুটিত হতে থাকে৷   
  
পনের শ শতকের আগের চিত্রশিল্প ও অঙ্কন ছিল প্রাণহীন৷ ছবিগুলো ছিল বিকৃত, দ্বিমাত্রিক ও বিশাল আকারে৷ ছোট্ট ও বিশ্রী প্রাসাদ থেকে চ্যাপ্টা নাইটদের উঁকি মারতে দেখা যেত (চিত্র ১৭)। সেরা শিল্পীরাও বাস্তবধর্মী দৃশ্য আঁকতে পারতেন না৷ তারা শূন্যের শক্তির ব্যবহার জানতেন না।   
  
চিত্র ১৭: চ্যাপ্টা নাইট ও বিশ্রী প্রাসাদ  
  
ইতালীয় স্থাপত্যবিদ ফিলিপো ব্রুনেলেশি প্রথম অসীম শূন্যের ব্যবহার দেখান৷ ভ্যানিশিং পয়েন্ট বা মিলিয়ে যাওয়া বিন্দু ব্যবহার করে তিনিই প্রথম একটি বাস্তবভিত্তিক ছবি আঁকেন৷   
  
মাত্রার ধারণা থেকে আমরা জানি, একটি বিন্দু একটি শূন্য৷ দৈনন্দিন জীবনে আমরা ত্রিমাত্রিক বস্তু নিয়ে কাজ করি৷ আইন্সটাইন দেখান, জগতটা আসলে চতুর্মাত্রিক। এটা নিয়ে আমরা পরেও কথা বলব৷ আপনার দেয়াল ঘড়ি, কফির মগ কিংবা এ বইটি সবই ত্রিমাত্রিক জিনিস৷ এখন একটু কল্পনা করুন: একটি বিশাল হাত বইটিকে চাপা দিল। ত্রিমাত্রিকের বদলে বইটি এখন দ্বিমাত্রিক এক আয়ত৷ বইটির একটি মাত্রা হারিয়ে গেছে। এর এখন শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে৷ উচ্চতা নেই৷ এবার ধরুন সেই দৈত্যাকার হাত বইটিকে পাশ থেকে চাপা দিল৷ বইট এখন আর আয়তক্ষেত্রের মতো নেই৷ হয়ে গেছে লাইন৷ আরেকটি মাত্রা কম এখন। নেই প্রস্থ ও উচ্চতা৷ আছে শুধু দৈর্ঘ্য৷ এটা এখন একমাত্রিক বস্তু৷ এই মাত্রাটাকেও উধাও করে দেওয়া যাবে৷ লাইন বরাবর আবার চাপা দিলে লাইন হয়ে যাবে বিন্দু৷ এক অসীম শূন্যতা, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কিছুই নেই৷ বিন্দু আসলে শূন্যমাত্রিক বস্তু৷   
  
১৪২৫ সালে ব্রুনেলেশি বিখ্যাত ফ্লোরেন্টাইন ভবন ব্যাপটিস্টেরির একটি চিত্রের কেন্দ্রে এমন একটি বিন্দু বসান৷ মিলিয়ে গিয়ে বিন্দুতে পরিণত এ শূন্যমাত্রিক বস্ত ক্যানভাসের ওপর অতিশয় ক্ষুদ্র একটি ডট। এর মানে হলো পর্যবেক্ষক থেকে অসীম দূরের বস্তু (চিত্র ১৮)। চিত্রের দূরের দৃশ্যগুলো ক্রমেই এই বিন্দুর কাছাকাছি হয়৷ পর্যবেক্ষক থেকে দূরে গেলে হতে থাকে ছোট থেকে আরও ছোট৷ মানুষ, গাছ বা বিল্ডিং-- সবকিছুই যথেষ্ট দূরে গেলে হয়ে যায় শূন্যমাত্রিক বিন্দু। হারিয়ে যায় দৃষ্টির সীমানা থেকে৷ চিত্রের কেন্দ্রের শূন্য অসীম স্থানকে ধারণ করে৷   
  
আপাত বিরোধী এই বস্তুই ব্রুনেলেশির চিত্রকে জাদুর মতো পাল্টে দিল৷ চিত্রটা ব্যাপ্টিস্টেরি ত্রিমাত্রিক ভবনকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলল৷ আসল বস্তুর সাথে যেন পার্থক্যই নেই৷ মজার ব্যাপার হলো ব্রুনেলেশি আয়নায় ভবনটিকে দেখে চিত্রের সাথে তুলনা করেন৷ প্রতিফলিত ছবির সাথে আঁকা চিত্র হুবহু মিলে গিয়েছিল৷ এই ভ্যানিশিং পয়েন্ট বা মিলিয়ে যাওয়া বিন্দু দ্বিমাত্রিক অঙ্কনকে ত্রিমাত্রিক ভবনের নিখুঁত নকলে পরিণত করল।

চিত্র ১৮: মিলিয়ে যাওয়া বিন্দু

মিলিয়ে যাওয়া বিন্দুতে শূন্য আর অসীমের সম্পর্ক কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। শূন্য দিয়ে গুণ সংখ্যারেখাকে ছোট করে বিন্দু বানিয়ে দেয়। একইভাবে ভ্যানিশিং পয়েন্ট মহাবিশ্বের প্রায় পুরোটাকে একটি ডটের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে। এ বিন্দুর নাম সিংগুলারিটি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে পরবর্তীতে এ ধারণা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে ঐ সময়ে গণিতবিদরা শূন্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চিত্রশিল্পীদের চেয়ে বেশি কিছু জানতেন না। পনের শতকে তো আসলে চিত্রশিল্পীরাই ছিলেন সৌখিন গণিতবিদ। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অঙ্কনের দৃষ্টিকোণ (perspective) নিয়ে একটি সহায়িকা লিখেছিলেন। চিত্রশিল্প নিয়ে তাঁর আরেক বইয়ে আছে এক সতর্কবাণী, “গণিতবিদ না হলে আমার লেখা পড়বে না।" এ গণিতবিদ-চিত্রশিল্পীরাই দৃষ্টিকোণ পদ্ধতিকে নিখুঁত করে তোলেন। অল্প দিনের মাথায় দেখা গেল, এরা যেকোনো বস্তুকে তিন মাত্রায় ফুটিয়ে তুলতে পারছেন। শিল্পীরা মুক্তি পেলেন সমতলের মতো চিত্রের হাত থেকে। শূন্য বদলে দিয়েছে শিল্পের জগতকে।।

আক্ষরিক অর্থেই শূন্য ব্রুনেলেশির চিত্রের কেন্দ্রে অবস্থান করছিল। গির্জাও শূন্য এবং অসীম নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখল। যদিও গির্জার মতবাদ তখনও এরিস্টটলের ওপর নির্ভরশীল। জার্মান কার্ডিনাল নিকোলাস অব কিউসা ব্রুনেলেশির সমসাময়িক মানুষ। তিনি অসীমের ধারণা দেখেই ঘোষণা করেন, “টেরা নন এস্ট সেন্ট্রা মুন্ডি।" । পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়। গির্জা তখনও বোঝেনি এ ধারণা কত বৈপ্লবিক হতে পারে।

মধ্যযুগীয় এরিস্টটলীয় মতবাদের একটি পুরনো ও শক্তিশালী কথা ছিল, “মহাবিশ্বের মধ্যে পৃথিবী অনন্য ও বিশেষ একটি জিনিস, যার মতো নেই আর কিছু।" এ কথাটাও ভ্যাকুয়ামের নিষেধাজ্ঞার মতোই শক্তিশালী ছিল। এ কথা অনুসারে, পৃথিবী আছে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থানের কারণে শুধু পৃথিবীতে প্রাণ ধারণের উপযোগী পরিবেশ আছে। এরিস্টটল মনে করতেন, সব বস্তু তাদের প্রকৃত অবস্থান খুঁজে পেতে চায়। পাথর বা মানুষের মতো ভারী জিনিসের স্থান ভূমি। বাতাসের মতো হালকার বস্তু থাকবে আকাশে। এ কথার ছিল নানান ফলাফল। এর অর্থ দড়ায়, গ্রহরা বায়ুর মতো হালকা জিনিস দিয়ে তৈরি। আরেকটি অর্থ হলো আকাশের মানুষ ভূমিতে পড়ে যাবে। ফলে বাদামের মতো মহাবিশ্বের খোলসের ভেতরের কেন্দ্রেই শুধু প্রাণীরা বাস করতে পারবে। অন্য গ্রহে প্রাণ থাকার ভাবনা এক গোলকের দুই কেন্দ্র থাকার মতোই হাস্যকর।

টেম্পিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর চাইলেই ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান তৈরি করতে পারেন। টেম্পিয়ের জোর দিয়ে বললেন, ঈশ্বর এরিস্টটলের যেকোনো নিয়ম ভাঙতে পারেন। ঈশ্বর চাইলেই অন্য পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। হাজার হাজার অন্য পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকতে পারে। সবগুলোতে থাকতে পারে প্রাণের অস্তিত্ব। এটা ঈশ্বরের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব। এরিস্টটল কী বললেন তাতে কিছু যায়-আসে না।

নিকোলাস অব কিউসা তো আরও এক ধাপ বেশি সাহসী। তিনি বললেন, ঈশ্বরে আসলে সেটাই করেছেন। তিনি বলেন, “অন্য তারার অঞ্চল আমাদের একইরকম। আমাদের বিশ্বাস, এদের কোনোটাই প্রাণ থেকে বঞ্চিত হয়নি।" আকাশে আছে অসীমসংখ্যক তারা। আকাশে জ্বলজ্বল করে গ্রহরা। চাঁদ ও সূর্য থেকে আসে আলো। আকাশের তারারা কেন আমাদের গ্রহ, চন্দ্র বা সূর্যের মতো হতে পারবে না? হয়তোবা তারা পৃথিবীকে উজ্জ্বল্ভাবে জ্বলতে দেখে, যেভাবে আমরা দেখি তাদেরকে।" নিকোলাস নিশ্চিত ছিলেন, ঈশ্বর আসলেই অসীমসংখ্যাক অন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী সরে গেল মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে। নিকোলাসকে তবুও ধর্মদ্রোহী বলা হয়নি। নতুন ভাবনার প্রতিও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি গির্জা।

এবার কাজে নামলেন আরেক নিকোলাস। তিনি নিকোলাসের দর্শনকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের রূপ দিলেন। নিকোলাস কোপার্নিকাস দেখালেন, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়। ঘুরছে বরং সূর্যকে কেন্দ্র করে।

সন্ন্যাসী ও চিকিৎসক কোপার্নিকাসের বাড়ি পোল্যান্ড। গণিত শিখেছিলেন জ্যোতিষবিদ্যার কাজ সহজ করার জন্য। যাতে করে তাঁর রোগীদের চিকিৎসা আরও ভাল করা যায়। ফলে কাজ করতে হলো গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে। আর তা করতে গিয়ে দেখলেন গ্রহদের গতিবিধির হিসাব রাখার গ্রিক নিয়ম অনেক অনেক জটিল। টলেমির ঘড়িসদৃশ আকাশ ছিল দারুণ নিখুঁত। যেখানে পৃথিবী ছিল কেন্দ্রে। তবে এ মডেল ছিল মারাত্মক জটিল। বছরজুড়ে গ্রহরা আকাশে চলাচল করে। তবে মাঝেমধ্যে থেমে যায়। চলতে থাকে পেছন দিকে।১ গ্রহদের এই অদ্ভুত আচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টলেমী নিয়ে আসেন মন্দবৃত্তের (epicycle) ধারণা। এরা হলো বৃত্তের পরিধির ওপরে কেন্দ্রবিশিষ্ট অন্য ছোট বৃত্ত। এদের মাধ্যমে গ্রহদের পেছনমুখী গতি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছিল (চিত্র ১৯)।

কোপার্নিকাসের ভাবনার শক্তিশালী দিক ছিল এর সরলতা। কেন্দ্রে পৃথিবী ও এর চারপাশে মন্দবৃত্তে পরিপূর্ণ মহাবিশ্বের বদলে তিনি সূর্যকেই কেন্দ্রে কল্পনা করলেন। যার চারপাশে গ্রহরা ঘোরে সরল বৃত্তপথে। কক্ষপথে পৃথিবী কোনো গ্রহকে পেছনে ফেললে সে গ্রহ পেছনে চলছে বলে মনে হবে। মন্দবৃত্তের কোনো দরকার নেই। কোপার্নিকাসের চিন্তা বাকস্তব উপাত্তের সাথে পুরোপুরি মেলেনি। কক্ষপথ আসলে বৃত্তাকার নয়। তবে সূর্যকেন্দ্রিক ধারণা ছিল সঠিক। টলেমির নমুনার চেয়ে তাঁর নমুনা ছিল অনেক সরল। পৃথিবী ঘোরে সূর্যের চারদিকে। *টেরা নন এস্ট সেন্ট্রা মুন্ডি*।

নিকোলাস অব কিউসা ও নিকোলাস কোপার্নিকাস এরিস্টটল ও টলেমির বাদামের খোসার মহাবিশ্বকে ভেঙে দিলেন। পৃথিবী সরে গেল মহাবিশ্বের কেন্দ্রের আরামদায়ক জায়গা থেকে। মহাবিশ্বকে ঘিরে নেই কোনো খোলস। মহাবিশ্ব বিস্তৃত অসীম অবধি। আছে অসংখ্যা বিক্ষিপ্ত জগত। সবগুলোতে হয়তো আছে রহস্যময় প্রাণী। কিন্তু অন্য সৌরজগতে প্রভাব রাখতে না পারলে রোম কীভাবে একমাত্র সঠিক গির্জার দাবিদার হবে? অন্য গ্রহে কি তবে অন্য পোপ আছে? ক্যাথলিক গির্জার জন্য অসুবিধাজনক এক অবস্থা। সে অসুবিধা আরও বড় হয়েছে নিজেদের ঘরের লোকদেরই চিন্তার পরিবর্তন শুরু হওয়ার কারণে।

১৫৪৩ সালে কোপার্নিকাস তাঁর সেরা কর্মটি প্রকাশ করেন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে। এর ঠিক পরপরই গির্জা নতুন চিন্তাগুলোকে দমন করা শুরু করে দিয়েছিল। নিজের *ডে রেভোউলশনিবাস* বইটা কোপার্নিকাস পোপ তৃতীয় পলের নামে উৎসর্গও করেছিলেন। তবে গির্জাও তখন আক্রান্ত। ফলে নতুন চিন্তা ও এরিরস্টটলকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা আর সহ্য করা হলো না।

গির্জার ওপর আক্রমণ তীব্র হয় ১৫১৭ সালে। কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত এক জার্মান সন্ন্যাসী উইটানবার্গের গির্জার দরজায় এক গুচ্ছ আপত্তির তালিকা সাঁটিয়ে দেন। (লুথার কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কোনো পণ্ডিত মনে করেন, তাঁর বিশ্বাসের ঘরে আলো জ্বলেছিল শৌচাগারে বসা অবস্থায়। এই তত্ত্ব বিষয়ে লেখা একটি বইয়ের মন্তব্য এরকম, “..............................।।/////” এভাবেই শুরু হয় সংস্কার-আন্দোলন। বুদ্ধিজীবিরা সকল দিকে পোপের কতৃত্বকে অস্বীকার করতে শুরু করলেন। ১৫৩০-এর দশকে সহজে সিংহাসনে বসে যাওয়া নিশ্চিত করতে অষ্টম হেনরি পোপের কতৃত্বকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন। নিজেকেই ঘোষণা করেন ইংল্যান্ডের প্রধান যাজক।

চিত্র ১৯: মন্দবৃত্ত, পেছনমুখী গতি ও সৌরকেন্দ্রিক নমুনা

ক্যাথলিক গির্জাও হানে পাল্টা আঘাত। কয়েক শতক ধরে নিজেরাও বিভিন্ন দর্শন নিয়ে পরীক্ষা-নিরিক্ষা চালাচ্ছিল ঠিকই, তবে নিজেদের মধ্যে মতভেদের হুমকি দেখা দিলে তারা পুনরায় অর্থডক্স বা প্রচলিত ধারায় ফিরে ফেল। গ্রহণ করে নিল প্রচলিত শিক্ষাকে। অগাস্টিন ও বোথিয়াসের মতো এরিস্টটলীয় দর্শনের পণ্ডিতদের দিকে ও এরিস্টটলের দেওয়া ঈশ্বরের প্রমাণের দিকে ঝুঁকে গেল। কার্ডিনাল ও যাজকদের জন্য প্রাচীন মতবাদ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ রাখা হলো না। শূন্য হলো ধর্মদ্রোহিতার নামান্তর। বাদামের খোসার মহাবিশ্বকে মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হলো। ভয়েড ও ইনফিনিটিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এসব শিক্ষা প্রচারের জন্য বেশ কিছু গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। ১৫৩০-এর দশকে সৃষ্ট এমন একটি অন্যতম গোষ্ঠীর নাম জেসুইট সম্প্রদায়। এ দলে ছিল সুপ্রশিক্ষিত একদল বুদ্ধিজীবি, যাদের কাজ প্রতিবাদী প্রোটেস্ট্যান্টদের আক্রমণ করা। ধর্মদ্রোহিতার সাথে লড়াই করার আরও অস্ত্রও ছিল গির্জা কাছে। স্প্যানিশ ইনকুইজিশন ১৫৪৩ সালে প্রোটেস্ট্যান্টদের পোড়ানো শুরু করে। যে বছর মারা গিয়েছিলেন কোপার্নিকাস। ঐ একই বছর পোপ তৃতীয় পল নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকা প্রকাশ করেন। গির্জার এই প্রতি-সংস্কারের লক্ষ্য ছিল নতুন চিন্তা দমন করে পুরনো মতবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বিশপ এঁটিয়ে টেম্পিয়ে ও কার্ডিনাল নিকোলাস অব কিউসা যে ধারণা তেরো শতকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, একই ধারণার জন্য ষোলো শতকে তাদের মৃত্যুদণ্ড হতে পারত।

হতভাগা জিওরডানো ব্রুনোর ক্ষেত্রে সেটাই ঘটল। ব্রুনো ছিলেন সাবেক ডমিনিকান যাজক। ১৫৮০-এর দশকে প্রকাশ করেন *অন্য দ্য ইনফাইনাইট ইউনিভার্স অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ডস* বই। এখানে তিনি নিকোলাস অব কিউসার মতো একই কথা বলেন। পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়। আমাদের মতো আছে আরও অসীম জগত। ১৬০০ সালে তাঁকে খুঁটির সাথে বেঁধে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। গ্যালিলেও গ্যালিলেই কোপার্নিকাস মতবাদের বিখ্যাত অনুসারী। ১৬১৬ সালে গির্জা তাঁকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। একই বছর কোপার্নিকাসের *ডে রেভোউলশনিবাস* নিষিদ্ধের খাতায় যুক্ত হয়। এরিস্টটলকে আক্রমণ করা মানে গির্জার ওপর আক্রমণ।

গির্জার প্রতি-সংস্কার নতুন দর্শনকে সহজে ধ্বংস করতে পারেনি। সময়ের সাথে সাথে এর শক্তি বাড়ল। এর পেছনে অবদান রেখেছেন কোপার্নিকাসের উত্তরসূরিরা। সতের শতকে এগিয়ে আসলে জ্যোতিষবিদ্য-সন্ন্যাসী জোহানেস কেপলার। কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে পরিশুদ্ধ করলেন তিনি। টলেমের নমুনার তুলনায় এটা আগের চেয়েও নিখুঁত হলো। পৃথিবীসহ বিভন্ন গ্রহ বৃত্তের বদলে উপবৃত্ত (ellipse) পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এর মাধ্যমে আকাশে গ্রহদের অবিশ্বাস্য রকম নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা গেল। সূর্যকেন্দ্রিক নমুনাকে ভূকেন্দ্রিক নমুনার চেয়ে খারাপ বলার আর সুযোগ থাকল না। কেপলারের নমুনা টলেমির নমুনার চেয়ে সরল। আর অনেক বেশি নিখুঁত। গির্জার আপত্তি পায়ে দলে কেপলারের সূর্যকেন্দ্রিক নমুনা টিকে গেল। কারণ কেপলার সঠিক, আর এরিস্টটল ভুল।

পুরনো মতবাদের ভুলগুলো ঠিক করার চেষ্টা গির্জা করল বটে! তবে ততদিনে এরিস্টটল, ভূকেন্দ্রিক নমুনা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কফিনে শেষ পেরেকটি মারা হয়ে গেছে। দার্শনিক যেসব কথা হাজার বছর ধরে বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছিলেন, তার সবগুলো নিয়ে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো হলো। এরিস্টটলীয় ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখা গেল না। আবার তাকে বাতিলও করা যাচ্ছে না। তাহলে কোনটা মেনে নিতে হবে? আক্ষরিকভাবে বললে, কিছুই না।

শূন্য এবং ভয়েড

এক অর্থে আমি ঈশ্বর ও শূন্যের মাঝামাঝি কিছু একটা।

- রেনে ডেকার্ট

ষোলো ও সতের শতকের দর্শন যুদ্ধের একদম কেন্দ্রে ছিল শূন্য ও অসীম (/////বইয়ে প্রথমবার ও মাঝেমাঝে ইনিফিনিটি বা অসীম এভাবে////। ভয়েড এরিস্টটলের দর্শনকে খোঁড়া করে দিয়েছিল। আর অসীম বড় মহাবিশ্বের ধারণা বাদামের খোসার মহাবিশ্বকে (/// nutshell universe////) ভেঙে চুরমার করে দেয়। পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টির কেন্দ্রে থাকতে পারে না। অনুসারীরা আর থাকল না গির্জার প্রভাবাধীন। ক্যাথলিক গির্জা এবার আগের চেয়ে তীব্র আকারে শূন্য ও ভয়েডকে অস্বীকার করতে চাইল। কিন্তু শূন্য তো আসন গেঁড়ে বসে গেছে। জেসুইট সম্প্রদায়ের মতো গির্জার প্রতি নিষ্ঠাবান বুদ্ধিজীবিরাও দোলাচলে পড়ে গেলেন। কেউ এরিস্টটলকে আঁকড়ে থাকলেন। কেউ আবার নতুন দর্শন মেনে নিলেন, যেখানে আছে শূন্য, ভয়েড ও অসীম।

রেনে ডেকার্টও জেসুইট হিসেবে প্রশিক্ষিত ছিলেন। তিনিও নতুন ও পুরনো মতবাদ নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি শূন্যকে প্রত্যাখ্যান করলেন, আবার রাখলেন নিজের কাজের কেন্দ্রবিন্দুতেও। ১৫৯৬ সালে ফ্রান্সের কেন্দ্রে তাঁর জন্ম। তিনি শূন্যকে নিয়ে এলেন সংখ্যারেখার মাঝে। অসীম ও ভয়েডের মাঝে ঈশ্বরের প্রমাণ খুঁজলেন তিনি। আবার এরিস্টটলকে পুরোপুরি ছাড়তে পারলেন না। ভয়েডের ভীতি ছিল তার মধ্যে প্রবল। সে ভয়ে তার অস্তিত্বই তিনি অস্বীকার করলেন।

পিথাগোরাসের মতো ডেকার্টও দার্শনিক-গণিতবিদ। তাঁর সবচেয়ে অমর কাজ সম্ভবত একটি গাণিতিক উদ্ভাবন। যাকে এখন আমরা বলি কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক। স্কুলে জ্যামিতি পড়া যে কেউ তা দেখেছে। বন্ধনীর ভেতরের এক গুচ্ছ সংখ্যা দিয়ে স্থানের ওপর বিন্দুর অবস্থান পাওয়া যায়। যেমন (৪,২) দিয়ে বোঝায় ৪ একক ডানে ও ২ একক উপরে। কিন্তু কার ডানে বা উপরে? এটাই মূলবিন্দু। শূন্য (চিত্র ২০)।

অক্ষরেখা ১ দিয়ে শুরু করা যাবে না--এটা ডেকার্ট বুঝলেন। তা করতে গেলে ভুল হয়ে যাবে। যে ভুল বিড করেছিলেন ক্যালেন্ডার ঠিক করতে গিয়ে। তবে বিডের সাথে ডেকার্টের পার্থক্য আছে। ডেকার্টের বাড়ি ইউরোপে। যেখানে আরবি সংখ্যার প্রচলন আছে। অতএব, তিনি শূন্য থেকে গণনা শুরু করলেন। স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার একদম কেন্দ্রে বসালেন শূন্যকে। যেখানে দুই অক্ষ একে অপরকে অতিক্রম করে গেছে। মূলবিন্দু (০,০) হলো কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি। (আমরা এখন যে চিহ্ন ব্যবহার করি, ডেকার্টের চিহ্ন তা থেকে একটু আলাদা ছিল। প্রথমত, তাঁর স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় ঋণাত্মক সংখ্যার ঠাঁই ছিল না। যদিও তাঁর সহকর্মী কদিন পরেই তাঁর হয়ে কাজটা করে দেন।

চিত্র ২০: কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক

নিজের স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার শক্তি বুঝতে ডেকার্ট মোটেই সময় নিলেন না। এর মাধ্যমে তিনি ছবি ও আকৃতিকে সমীকরণ ও সংখ্যায় পরিণত করলেন। কার্তেসীয় স্থানাঙ্কের মাধ্যমে বর্গ, ত্রিভুজ, তরঙ্গাকার রেখার মতো সব জ্যামিতিক বস্তুকে গাণিতিক সম্পর্কের সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব হলো। যেমন ধরুন, মূল বিন্দুতে কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত। একে প্রকাশ করা যাবে এক সেট বিন্দু দিয়ে, যাদের জন্য x^2 + y^2 – 1 = 0 সমীকরণটি সত্য। পরাবৃত্ত হতে পারে y – x^2 = 0। সংখ্যা ও আকৃতির মিলন ঘটালেন ডেকার্টে। পশ্চিমের জ্যামিতি শিল্প আর প্রাচ্যের বীজগণিত শিল্প আর আলাদা থাকল না। তারা একই হয়ে গেল। সব আকৃতিকেই f(x , y) = 0 আকারের সমীকরণ হিসেবে লেখা যায় (চিত্র ২১)। স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল শূন্য। আর যেকোনো জ্যামিতিক আকৃতিতে ভেতরে ভেতরে শূন্য লুকায়িত ছিল।

ডেকার্টের মন বলত, ঈশ্বরের সাম্রাজ্যেও শূন্য আছে ভেতরে ভেতরে। ঠিক যেমন আছে অসীম। ওদিকে এরিস্টটলীয় দেয়াল হেলে যাচ্ছিল। ডেকার্ট আবার জেসুইট সম্প্রদায়ের নিবেদিত সৈনিক। তাই তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পুরনো প্রমাণের বদলে শূন্য ও অসীম দিয়ে নতুন প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালালেন।

প্রাচীনকালের মানুষের মতো ডেকার্টও মনে করতেন শূন্য থেকে কোনো কিছু তৈরি করা যায় না। এমনকি জ্ঞানও না। এর অর্থ দাঁড়ায়, সকল চিন্তা-ভাবনা, সকল দর্শন, ভবিষ্যতের সব আবিষ্কার জন্মের সময় মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যেই থাকে। জ্ঞানার্জন মানে আসলে মহাবিশ্বের ক্রিয়াকৌশল সম্পর্কে আগে থেকে স্থাপিত সেই সূত্রগুলো বের করে আনা। ডেকার্টের মতে, আমাদের মনের মধ্যে অসীমরকম নিখুঁত এক সত্তার ধারণা আছে। অতএব, এই অতিশয় নিখুঁত সত্তা বা ঈশ্বর অবশ্যই আছেন। অন্য সবার মধ্যে তার তুলনায় কমতি আছে। তারা সসীম। অবস্থান শূন্য ও ঈশ্বরের মাঝামাঝি কোথাও। অসীম ও শূন্যের মিশ্রণ।

ডেকার্টের দর্শনে শূন্যের বারবার দেখা গেছে। তবে মৃত্যুর আগ পর্যন্তও তিনি মনে করতেন ভয়েড বা চূড়ান্ত শূন্যের অস্তিত্ব নেই। ডেকার্ট প্রতি-সংস্কার আন্দোলনের সময়ের সন্তান। ডেকার্ট এরিস্টটল সম্পর্কে জেনেছেন এমন এক সময়ে যখন গির্জা তার মূলনীতিগুলোর ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল ছিল। ফলে এরিস্টটলের মতবাদ ডেকার্টের মাথায় আসন গেঁড়ে নেয়। সে প্রভাবের স্বীকার হয়ে তিনি ভ্যাকুয়ামকে অস্বীকার করেন।

চিত্র ২১: একটি পরাবৃত্ত, বৃত্ত ও উপবৃত্তাকার রেখা

এ সময় আসলে কোনো একটি পক্ষ বেছে নেওয়া কঠিন ছিল। ভ্যাকুয়ামকে পুরোপুরি অস্বীকার করার অধিবিদ্যাগত সমস্যা ডেকার্টের অবশ্যই জানা ছিল। জীবনের শেষের দিকে তিনি পরমাণু ও ভ্যাকুয়াম সম্পর্কে লেখেন, “বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে এটা অব্যশ্যই বলা যায় যে এগুলো ঘটবে না। তবে কেউ এটাও অস্বীকার করতে পারবে না, এগুলো ঈশ্বরই করতে পারেন। যেমন, তিনি প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্তন করতে পারেন।" তবুও তাঁর আগের মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের ধারণাই লালন করতেন তিনি। বিশ্বাস করতেন, কোনো কিছুই সরলপথে চলতে পারে না। কারণ তাতে করে পেছনে ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান তৈরি হবে। বরং মহাবিশ্বের সবকিছু চলে বৃত্তাকার পথে। এটা আসলে ছিল এরিস্টটলীয় চিন্তা। তবু যত কিছুই হোক, শেষ পর্যন্ত ভয়েড বা শূন্যতা কিছুদিনের মধ্যেই এরিস্টটলকে চিরতরে ডুবিয়ে দেয়।

আজকের দিনেও শিশুদের শেখানো হয়, “প্রকৃতি শূন্যস্থান অপছন্দ করে।" শিক্ষকরা হয়তো ঠিক জানেন না এ কথাটার উৎপত্তি কোথায়। এটা ছিল এরিস্টটলীয় দর্শনের সম্প্রসারিত একটি অংশ: শূন্যস্থানের অস্তিত্ব নেই। কেউ শূন্যস্থান তৈরি করতে চাইলে প্রকৃতি তা ঠেকানোর জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করবে। কথাটাকে ভুল প্রমাণ করেন গ্যালিলেওর সহকারি ইভানজেলিস্টা টরিসেলি। তিনিই প্রথম ভ্যাকুয়াম তৈরি করেন।

ইতালির শ্রমিকরা কুয়া ও খাল থেকে পানি তুলতে এক ধরনের পাম্প ব্যবহার করত, যা অনেকটা বড় সিরিঞ্জের মতো কাজ করত। পাম্পের মধ্যে ছিল একটি পিস্টন, যা একটি নলের ভেতরে আঁটোসাঁটো করে লাগানো থাকত। নলের নিচের মাথা পানিতে ডোবানো থাকত। পিস্টনকে উপরে তোলা হলে পানির স্তর নল বেয়ে উঠে আসত।

এক শ্রমিকের কাছে গ্যালিলেও জানতে পেরেছিলেন, এ পাম্পে একটি সমস্যা হচ্ছিল। এটি দিয়ে পানি ওঠানো যেত মাত্র ৩৩ ফুট। এরপরে উপরের চাপদণ্ড যতই উঠতে থাকুক, পানির স্তর একই থাকত। সমস্যাটা কৌতূহলের জন্ম দিল। গ্যালিলেও তাঁর সহকারি টরিসেলির কাছে পাঠিয়ে দেন সমস্যাটি। কাজ পেয়ে টরিসেলি পরীক্ষা-নিরিক্ষা শুরু করলেন। তাঁকে জানতেই হবে পাম্পের রহস্যময় সীমাবদ্ধতার রহস্য। ১৬৪৩ সালের কথা। টরিসেলি পরীক্ষা চলানোর জন্য লম্বা একটি নল নিলেন। এক মাথা বন্ধ করে পারদ দিয়ে ভর্তি করলেন একে। এবার উপুড় করে খোলা মাথা পারদ ভর্তি একটি পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। নলটাকে বায়ুর মধ্যে উপুড় করলে পারদ পড়ে গিয়ে বাতাস দিয়ে ভর্তি হত নল। ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান তৈরি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু টরিসেলি তো তা না করে নলটিকে ডুবিয়েছেন পারদের মধ্যে। নলের পারদের জায়গা দখলে নেওয়ার জন্য বাতাসের আসার সুযোগ নেই। প্রকৃতি সত্যিই শূন্যস্থানকে অপছন্দ করলে নলের পারদ উপরেই ঝুলে থাকত। নিচে পড়ে গেলেই তো উপরে শূন্যস্থান তৈরি হবে। কিন্তু পারদ তা করেনি। নেমে গেল খানিকটা। উপরে থাকল ফাঁকা স্থান। এই স্থানে কী থাকল? কিছুই না। ইতিহাসে এই প্রথম কেউ শূন্যস্থান ধরে রাখতে পারলেন।

নল যত বড়-ছোট যাই হোক, পারদ নিচে নেমে যাচ্ছে। থেমে যাচ্ছে পাত্র থেকে প্রায় ৩৩ ইঞ্চি উপরে এসে। অন্যভাবে বললে, উপরের শূন্যস্থানের সাথে লড়াই করে পারদ ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত উপরে উঠতে পারে। প্রকৃতি সর্বোচ্চ ৩০ ইঞ্চির ভ্যাকুয়াম অপছন্দ করে। ব্যাপারটা ব্যখ্যা দিয়েছিলেন ডেকার্ট বিরোধী আরেক পণ্ডিত।

১৬২৩ সালে ডেকার্টের বয়স ২৭ বছর। ডেকার্টের ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী লেইজ প্যাসকেলর বয়স তখন শূন্য। প্যাসকেলের বাবা এঁটিয়ে ছিলেন গুণী বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। তরুণও প্যাসকেলও ছিলেন বাবার মতোই মেধাবী। তরুণ বয়সে তিনি প্যাসকালিন নামে একটি যান্ত্রিক হিসাব যন্ত্র বানান। ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর আসার আগে প্রকৌশলীদের ব্যবহৃত কিছু ক্যালকুলেটরের সাথে এর মিল ছিল।

প্যাসকেলের বয়স ২৩ বছর থাকতে তার বাবা বরফখণ্ডের ওপর পিছলে পড়ে গিয়ে উরু ভাঙেন। একদল জ্যানসেনবাদী তার যত্ন নেন। ক্যাথোলিক এই গোষ্ঠীটি গড়ে ওঠেছিল মূলত জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ্পূর্ণ মনোভাব নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই প্যাসকেলের পুরো পরিবারের মন জয় করে নেয় তারা। প্যাসকেলও জেসুইট বিরোধী হয়ে গেলেন। প্রতি-প্রতি-সংস্কারবাদী। নতুন পাওয়া ধর্মটা প্যাসকেলের জন্য মানানসই ছিল না। এ গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশপ জ্যানসেন। তিনি ঘোষণা করেন বিজ্ঞানচর্চা পাপ। প্রাকৃতিক বিশ্বের প্রতি কৌতূহল এক ধরনের লালসা। ভাগ্য ভাল, প্যাসকেলের এ লালসা কিছু সময়ের জন্য হলেও তাঁর ধর্মীয় আবেগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। তিনি বিজ্ঞান দিয়েই ভ্যাকুয়ামের রহস্য আবিষ্কার করেন।

প্যাসকেলের ধর্মান্তরের সময় এঁটিয়ের এক বন্ধু তাদের বাড়িতে এলেন। পেশায় সামরিক প্রকৌশলী। তিনি টরিসেলির পরীক্ষা করে দেখালেন প্যাসকেলকে। প্যাসকেল তাতে মুগ্ধ। পানি, মদ ও অন্যান্য প্রবাহী পদার্থ নিয়ে নিজেই পরীক্ষা শুরু করলেন। এর ফলাফলই ১৬৪৭ সালে *নিউ এক্সপেরিমেন্টস কন্সার্নিং ভ্যাকুয়াম* (শূন্যস্থান সম্পর্কে নতুন পরীক্ষা) হিসেবে প্রকাশিত হয়। তবে এতেও মূল প্রশ্নটির উত্তর এল না। পারদ কেন ৩০ ইঞ্চি ওঠে আর পানি ৩৩ ফুট? সে সময়ের কিছু তত্ত্ব এরিস্টটলের দর্শনের কিছু অংশকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। বলা হয়, প্রকৃতির শূন্যুস্থান ভীতি সীমিত। শূন্যস্থানের নির্দিষ্ট কিছু অংশই কেবল নষ্ট করা যায়। তবে প্যাসকেলের ভাবনা ছিল আলাদা।

১৬৪৮ সালের শরৎকাল। প্যাসকেলের মাথায় হঠাৎ একটা ভাবনা এল। শালাকে পাঠিয়ে দিলেন পাহাড়ের ওপর। সাথে পারদ ভর্তি নল। পাহাড়ের চূড়ায় পারদ ৩০ ইঞ্চির চেয়ে অনেক কম উঠল (চিত্র ২২)। প্রকৃতি কি তবে সমতলের চেয়ে পাহাড়ে শূন্যস্থান দ্বারা কম প্রভাবিত হয়?

চিত্র ২২: প্যাসকেলের পরীক্ষা

প্যাসকেলের মতে, আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত এ আচরণ প্রমাণ করে, পারদের নল বেয়ে ওঠার কারণ ভ্যাকুয়ামভীতি নয়। আসল কারণ হলো বায়ুমণ্ডলের ওজন পাত্রের পারদেকে নিচের দিকে চাপ দিচ্ছে। আর তাতে পারদ ফাঁকা নল বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। পানি বা পারদ যাই হোক, বায়ুর চাপে তা খালি নল বেয়ে উঠে যাবে উপরে। ঠিক যেভাবে টুথপেস্টের নলের নিচে আলতো চাপ দিলে পেস্ট উপর দিয়ে বের হয়ে আসে। এখন, বায়ুর চাপ তো সীমিত। এ চাপ পারদকে চাপ দিয়ে ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত ওঠাতে পারে। পাহাড়ের চূড়ায় বায়ুর চাপ কম। তাই সেখানেও ৩০ ইঞ্চিও পারে না।

এখান একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে। শূন্যস্থান কিছুকে টেনে নেয় না। বরং বায়ুমণ্ডল চাপ দেয়। প্যাসকেলের এ সরল পরীক্ষা এরিস্টটলের বক্তব্যকে উড়িয়ে দিল। প্রকৃতি শূন্যস্থানকে ঘৃণা করে না। প্যাসকেল লেখেন, “এখন পর্যন্ত কেউ বলেনি, শূন্যস্থানের সাথে প্রকৃতির কোনো অনীহা নেই। প্রকৃতি শূন্যস্থানকে এড়িয়ে চলার কোনো চেষ্টা করে না। বরং শূন্যস্থানকে বিনা বাক্যে ও বিনা বাধায় মেনে নেয়।" এরিস্টটল পরাজিত হলেন। বিজ্ঞানীদের ভয়েডভীতি দূর হলো। শুরু করলেন ভয়েডের বিশ্লেষণ। নিষ্ঠাবান জ্যানসেনবাদী প্যাসকেল শূন্য এবং অসীমের মাঝেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজলেন। কাজটি করলেন এক ধরনের অবজ্ঞার মধ্য দিয়ে।

ঈশ্বর নিয়ে বাজি

প্রকৃতিতে মানুষ কী?অসীমের তুলনায় কিছুই না। শূন্যের তুলনায় সবকিছু। শূন্য ও সবকিছুর মাঝামাঝি কিছু একটা।

-- ব্লেইজ প্যাসকেল, পেনসিস।

প্যাসকেল একইসাথে বিজ্ঞানী ও গণততবিদ। বিজ্ঞানী হিসেবে করেছেন শূন্যস্থানের অনুসন্ধান। ভয়েডের বৈশিষ্ট্য। গণিতে অবদান রেখেছেন একেবারে নতুন একটু শাখা তৈরিতে। সে শাখার নাম সম্ভাবনা তত্ত্ব। সম্ভাবনা তত্ত্বকে শূন্য ও অসীমের সাথে মিলিয়ে তিনি পেলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

সম্ভাবনা তত্ত্ব তৈরি হয়েছিল অভিজাত ধনী লোকদের জুয়ায় বেশি লাভ করতে সহায়তার উদ্দেশ্যে। প্যাসকেলের তত্ত্ব ছিল দারুণ সফল। কিন্তু তাঁর গণিতচর্চা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৬৫৪ সালের ২৩ নভেম্বর। প্যাসকেলের মধ্যে তীব্র এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়। হয়তোবা এটা জ্যানসেনবাদীদের বিজ্ঞানবিরোধিতার প্রভাব। তবে কারণ যাই হোক, প্যাসকেলের নতুন আবেগ তাঁকে গণিত ও বিজ্ঞান থেকে পুরোপুরি দূরে সরিয়ে দিল। (চার বছর পরে একবার এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। সেসময় অসুস্থতার কারণে তাঁর ঘুমের সমস্যা হচ্ছিল। গণিতচর্চা শুরু করলে ব্যথা কমে যায়। প্যাসকেল মনে করতেন এর মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁকে বার্তা দিয়েছেন, তার জ্ঞানচর্চায় তিনি নাখোশ নন।) তিনি হয়ে গেলেন ধর্মতাত্ত্বিক। কিন্তু নিজের মূল পরিচয় ছাড়তে পারলেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়েওও বারবার তিনি বোকা ফরাসি জুয়াড়িদের কাছে ফিরে গেলেন। প্যাসকেল বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরকে বিশ্বাস করাই ভাল। কারণ আক্ষরিক অর্থেই বাজি ঈশ্বরের পক্ষে।

ঠিক জুয়ার প্রত্যাশিত লাভ হিসাব করার মতো করেই তিনি ঈশ্বরকে মেনে নেওয়ার হিসাব কষলেন। শূন্য ও অসীমের গণিতের মাধ্যমে তিনি সিদ্ধান্তে আসলেন, ঈশ্বর আছেন বলেই ধরে নেওয়া উচিত।

বাজির হিসাব দেখার আগে সহজ আরেকটি খেলা দেখে নেওয়া যাক। ধরুন ক ও খ নামে দুটি খাম আছে। আপনাকে খাম দেখানোর আগে কয়েন টস করে ঠিক করা হলো কোন খামে কত টাকা থাকবে। টসে হেড পড়লে ক খামে ১০০ টাকা থাকবে। আর টেল পড়লে টাকা থাকবে খ খামে। পরিমাণ ১০, ০০০,০০০। আপনি কোন খামটি নেবেন?

অবশ্যই খ। এতে আছে অনেক বেশি টাকা। সম্ভাবনার তত্ত্বের প্রত্যাশা (expectation) বলতে একটি হাতিয়ার আছে। যা দিয়ে আমরা বুঝতে পারব প্রতিটি খামের মান কত হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। ক খামে ১০০ টাকা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। তবে খামের একটা দাম আছে। তবে সেটা ১০০ পর্যন্ত নয়। কারণ আমরা নিশ্চিত করে জানি না, এতে টাকা আছে কিনা। গণিতবিদ খামের সম্ভাব্য পরিমাণগুলো যোগ করবেন। গুণ করবেন ঐ পরিমাণের সম্ভাবনা দিয়ে।

০ জেতার সম্ভাবনা ১/২ × ০ টাকা = ০ টাকা

১০০ টাকা জেতার সম্ভাবনা ১/২ × ১০০ টাকা = ৫০ টাকা

মোট প্রত্যাশা = ৫০ টাকা

ফলে ক খামের প্রত্যাশিত মান ৫০ টাকা।

একইভাবে খ খামের প্রত্যাশিত মান বের করা যাবে।

০ জেতার সম্ভাবনা ১/২ × ০ টাকা = ০ টাকা

১০,০০০,০০০ টাকা জেতার সম্ভাবনা ১/২ × ১০,০০০,০০০ টাকা = ৫,০০,০০০ টাকা

মোট প্রত্যাশা = ৫,০০,০০০ টাকা /// টেবিলে////

অতএব খ খামের প্রত্যাশিত মান ক খামের ১০,০০০ গুণ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দুই খামের মধ্যে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকলে খ খাম নিতে হবে।

প্যাসকেলের বাজিও এই খেলার মতোই। পার্থক্য হলো এখানে দুই খামের বদলে আছে খৃষ্টান ও নাস্তিক।

তথ্যনির্দেশ

১। গ্রহদের চলাচলের ব্যতিক্রমী আচরণের ব্যাখ্যা জানতে পড়ুন লেখকের বই *মহাবিশ্বের সীমানা (পৃষ্ঠা নং)।*